গুহা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

গুহা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

কে একজন বলেছিল, আমার নামে কুকুর পুষবে। সে বেশ কিছুকাল আগের কথা। আমি তখন বুড়ো-হাবড়া হয়ে যাইনি। বেশ শক্তপোক্ত, ধান্দাবাজ একজন মানুষ। যত না ভাত-ডাল খাই, তার চেয়ে বেশি ঘুস খাই। আমাকে দেয় তাই আমি খাই। আমি তো কেড়ে খাই না। আমি কি ছিনতাইবাজ, তোলাবাজ। ওসব ছোটলোকদের লাইন। ঝট করে বড়লোক হওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু ক'দিনের জন্যে। অপঘাতে তোমাকে মরতেই হবে। হয় ছুরিতে, না হয় গুলিতে। হাতকাটা শ্যামল, নাক থ্যাবড়া ভোলা, এই রকম কত নাম। চচ্চড় করে উঠল, ধড়ধড় করে পড়ল। জীবনে শিক্ষার অনেক কিছু আছে, শুধু বই পড়লেই হবে? যদ্দিন বাঁচি তদ্দিন শিখি। সৎ পথে থাকব, শাস্ত্র মেনে চলব। আমার ধর্মগুরু আমাকে প্রথম দিনই মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, 'বাবা, কোনো কিছু সঙ্গে যাবে না, যাবে কর্মফল। সৎ কর্মের ফল উপকারী, অসৎ কর্মের ফল অপকারী। আমের ফল পুষ্টি, আমড়ার ফল অম্বল।'

'এখন তুমি জিজ্ঞেস করতে পার আপনার গুরু কে? খুবই স্বাভাবিক।'

'আমি তখন আমার বুকে ঘুসি মেরে বলব, আমার গুরু আমি নিজে। জীবনের বেশ কিছুটা চিবিয়ে খেয়ে যখন মনে হল, কই আর তো স্বাদ পাচ্ছি না তেমন। সেই রোজকার ডাল, ভাত, চচ্চড়ি, তখন নিজের ওপর খুব রেগে উঠলুম। নির্জনে দাঁড়িয়ে নাটকের চরিত্রের মতো চিৎকার করে উঠলুম, 'ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্র!' প্রশ্ন এল, 'কার ষড়যন্ত্র?' উত্তর, 'আমার নিজের, আমার স্বভাবের। আমার স্বভাব আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে।' শোন না, যে-কথাটা বলছি, লেখাপড়ায় খুব ভালো ছিলুম। ভালো ছেলে, ইংরিজি সাহিত্য গুলে খেয়েছি। দর্শন পড়েছি। কিন্তু প্রবৃত্তি এত নীচ কেন? এত লোভ কেন! আমার অবচেতনে কি আছে? জন্মসূত্রে অতীতের উত্তরাধিকার? যে-পরিবারে এসেছি তাদের অতীত দেখতে হবে। পিতার দিক, মাতার দিক। আমার রক্তে কার প্রভাব! খুব বেশি খোঁজাখুঁজির প্রয়োজন হল না। পাকা গোয়েন্দার মতো সহজেই ধরে ফেললুম। আমার এক পূর্বপুরুষ এই পরিবার থেকে হারিয়ে গেছেন। তাঁর নাম কেউ করে না। কোনোভাবে তাঁর প্রসঙ্গ এলে সবাই চুপ। গোপনে অনুসন্ধান করতে করতে জানতে পারলুম, তিনি ধনী পরিবারে বিবাহ করেছিলেন, সুন্দরী স্ত্রী। তথাপি তিনি এক বাগদী রমণীকে নিয়ে আলাদা থাকতেন। শেষে পাগল হয়ে গেলেন। তাঁকে পাগল করে দেওয়া হল। উঁচু জায়গা থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। এক প্রবীণা, যিনি আমাদের পরিবারের অতীত জানেন, তিনি আমাকে এই কাহিনি শোনাচ্ছিলেন, তখন আমার অদ্ভুত একটা উত্তেজনা হচ্ছিল। এক পতিতার করাল গ্রাস। একটা সাপ একটা ব্যাঙকে ধীরে ধীরে গিলছে। বিকৃত সুখ। খাদক যখন খাদ্যকে চিবোয় তখন খাদ্যের কি আনন্দ হয়? হয় তো হয়। আমার এই অনুভূতি হওয়াতেই আমি বুঝলুম আমিই সেই। নৈতিকতার দিক থেকে আমি নিঃস্ব। লেখাপড়ায় চরিত্রের সংস্কার বদলায় না। ভেতরের অন্ধকার ঘোচে না। নাচমহলে হাজার বাতির রোশনাই, খাসমহলে অন্ধকার।

'বুঝলে! লোকটা ভালো নয়। এক সময় ভাবলুম এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি কেন? আসল কথা তো রোজগার, টাকা। তার তো অভাব নেই। খাওদাও ফুর্তি কর। টাকায় মদ, মেয়েমানুষ হয়। সবচেয়ে আনন্দ তো সেইখানে। আমার সহকর্মী প্রতাপ তো তাই করে। কিন্তু সে যখন কাছে আসে বিশ্রী একটা পচা গন্ধ। মানুষটি ভেতরে ভেতরে পচতে শুরু করেছে। কেউ বুঝতে পারে না, আমি পারি। ওর স্পর্শ করা জিনিস আমি খেতে পারি না। ওর চেয়ারে বসতে পারি না। শরীরে একটা তাপ অনুভব করি। একদিন গভীর রাতে প্রতাপ সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুর বিশেষ একটি জায়গা দিয়ে টলতে টলতে হেঁটে যাচ্ছে। ধরে আছে লুঙ্গিপরা বিশ্রী একটা লোক। একটা ট্যাক্সিতে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল। প্রতাপের বউ আছে। ছেলে আছে, বৃদ্ধা মা জীবিত। প্রতাপ গড়াতে গড়াতে বাড়িতে ঢুকবে। হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়িতে উঠবে। পরিবারের কারোকে চিনতে পারবে না। একটু আগে যা যা করেছে তাও মনে পড়বে না। অচৈতন্য অবস্থায় রাতটা কাটিয়ে দেবে। একদিন না একদিন প্রতাপের চাকরি যাবে। টাকার উৎস চলে যাবে অন্য আর এক প্রতাপের হাতে। প্রতাপের মেয়েমানুষের পাশে শুয়ে থাকবে আর এক প্রতাপ। হৃষ্টপুষ্ট এই প্রতাপের মেদ ঝরতে থাকবে। গায়ের চামড়া ঝুলে পড়বে ঢিলে পাঞ্জাবির মতো। শ্বাসকষ্ট, অন্য নানা অসুখ। যুবক পুত্র দূর থেকে তার এই পিতাটিকে দেখবে, লোলচর্ম, জড়দগব। টাকার দুনিয়া টাকার জোরে যেমন চলছিল সেই রকমই চলবে। দুনিয়া দু'চাকার গাড়ি, একটা ধর্ম, আর একটা অধর্ম। দুটোই একই সঙ্গে ঘুরছে, একই গতিবেগে। কালের গাড়ি, কলের গাড়ি ছুটছে দিশাহীন। যে-পথের শেষ নেই, সে পথের কোনো গন্তব্য নেই। যাওয়াটাই আছে, থামাটা নেই।

'বড্ড বেশি বকছি? তুমিই তো বললে, 'বলে যান। আমি শুনছি।' তুমি শুনছ কিনা জানি না, আমি কিন্তু আমার কথা শুনছি। বেশ ভালো লাগছে। বাইরে তাকিয়ে দেখ জানলা দিয়ে পাহাড় এসে দাঁড়িয়েছে। ক'দিন পরেই মাথাটা কেমন সাদা হয়ে যাবে। আলোর খেলায় কখনো সোনা, কখনো রুপো। সারি সারি, বড় বড় গাছ কোথাও নীচের দিকে নেমে গেছে, কোথাও আবার ওপর দিকে উঠছে! যেন স্থির পথিক। একজন আর একজনকে এগিয়ে দিচ্ছে। নীচের উপত্যকা কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যাবে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। আমি নিজেকে এই পর্যন্ত আনতে পেরেছি। কিন্তু কি ভাবে? টিকিট কেটে ট্রেনে চড়ে, গাড়িতে চেপে, পায়ে হেঁটে আসা যায়, কাঁধে ক্যামেরা ঝোলানো ট্যুরিস্ট। আসে, যায়। এল কিন্তু গেল না। কেন? কি এমন হল? শহরের কীট! শোনো, সব সময় আলোই যে গুরু তা নয়, অন্ধকারও গুরু। গঙ্গায় পড়লেই জীবন পাল্টাবে তা নয়, নর্দমায় পড়লেও হতে

পরে। রাতারাতি বদলে গেলে। ওই যে প্রতাপ, ওর শেষটা যা হবে ভেবেছিলুম, তা হল না। প্রতাপ সেই রাতে বেধড়ক মার খেয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এল। একেবারে অন্য মানুষ। প্রতাপ তখন আমাকে ঘৃণা করছে। আমাকে কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। গম্ভীর গলা, 'আমার কাছে কি দরকার?'

আশ্চর্য ব্যাপার, তুমিই আমাকে নষ্ট করলে, এখন তুমিই আমাকে খেদিয়ে দিচ্ছ! ভীষণ রাগ হল। প্রথমে প্রতাপের ওপর, তারপর নিজের ওপর। কত বড় বংশের ছেলে আমি! আমার এমন পতন কেমন করে হল! প্রলোভন তো থাকবেই। সংযমের লাগাম নিজের হাতে নেই কেন? কে কাকে খারাপ করতে পারে? নিজেই নিজেকে নষ্ট করে। এক সময় মনে হল, নষ্ট যখন হয়েছি, নিজেকে আরো নষ্ট করব। টাকার তো অভাব নেই। টাকা থাকলেই তো সব পথ খোলা—ধর্মের পথ, অধর্মের পথ। এত ভাবনা কিসের? বয়েস আছে ফুর্তি করো। এক সঙ্গী যায় তো আর এক সঙ্গী আসে। ভাত ছড়াও, প্রচুর কাক।

'তুমি ভাবছ কেন আমি পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটছি! আসলে কি জান অতীতই আমাদের গুরু। এক জীবন আর এক জীবনকে শেখায়। আগে খালি করা, তারপর ভরে ওঠা। বেঁচে থাকার দোষটা কি জান, প্রতি মুহূর্তে ভেতরে ময়লা জমছে। চায়ের কেটলির মতো কালো আরো কালো। রোজ ঘষতে হবে। প্রলোভন নিজেই তৈরি করে নিজেকে পরীক্ষা করো সরে আসতে পারছ কি না? সুন্দরীর কোলে বসে পরীক্ষা নাও উত্তেজনার মাত্রা কতটা! মনের অবস্থাটা কি? গঙ্গার জল, নর্দমার জল এক মনে হচ্ছে কি? সুন্দরীর কোল আর সোফার গদিতে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছ না। কাঞ্চন আর খোলামকুচি এক। বুঝলে এ বড় সাংঘাতিক কথা। এর আড়াল দিয়ে অনেক শয়তানি, ভণ্ডামি ঢুকতে পারে। কেমন জান, পর্দার আড়ালে নগ্ন হওয়া। এমনও তো মনে করতে পারি, আমার পকেট ভর্তি ঘুসের টাকা তো নয়, ওসব খোলামকুচি। চলো না একবার ঘুরে আসি সেই পাড়ায়। আমি এক নিরাসক্ত যোগী, ইন্দ্রিয়াতীত।'

।। দুই।।

'আজ খুব শীত। তোমার শীত করছে না? তুমি তো সমতলবাসী!'

'আপনিও তো কলকাতার মানুষ!'

'সে এক যুগ আগে। তখন তোমাদের ওখানে ডাক্তার বিধানচন্দ্রের কাল। তখন তুমি জন্মাওনি।'

'সে ঠিক। তবে এখানে আপনার আশ্রয়ে, কৃপায় শীত সহ্য হয়ে গেছে।'

'তুমি আমাকে খুশি করার জন্যে বারে বারে কৃপা শব্দটা ব্যবহার কর, যেমন দাঁড়ে বসে চন্দনা না বুঝেই রাধা, রাধা, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ করে। কৃপা কাকে বলে—কোনো ধারণা আছে?'

'আছে। জীবনে সবচেয়ে খারাপ হওয়াটাই প্রকৃত কৃপা। ঘর, সংসার শেষ, আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। কপর্দকশূন্য ভিখারির দশা। প্রাণ থাকে কি যায়। বসে বসে দেখছি, মুচকি মুচকি হাসছি। মনে মনে ভাবছি, দেখি আরো কি হয়!'

'প্রতিরোধের চেষ্টা করবে না?'

'প্রতিরোধ তো একটাই, হাসিমুখে সহ্য করা। মারতে মারতে প্রহারকারী, দণ্ডদাতা ক্লান্ত। হাত থেকে চাবুক পড়ে গেল। যাকে প্রহার করা হচ্ছিল, সে এসে বলছে, প্রভু! কত কষ্ট হল আপনার? আসুন, আপনার সেবা করি। বাতাস করি।'

'সবই তোমার কেতাবে পড়া কথা। একটা অন্য দরজা দিয়ে বেরোবার চেষ্টা। বাস্তব অনেক বড়। সেখানে আমরা কীট-পতঙ্গ। এস, এই বটতলায় বসা যাক। সামনে গঙ্গা। এমন নদী পৃথিবীতে আর দুটো নেই। জীবনের প্রথম কথা, জীবনের শেষ কথা এই নদীতে। বোসো, বোসো। সূর্যের শেষ আলো।'

'জানেন তো গঙ্গা আমার কাছে বিষণ্ণ নদী। আমার বাবা, মা, ছোট বোন নৌকাডুবিতে মারা গেছে। একসঙ্গে তিনজন। অষ্টমীর উৎসবের রাতে। শেষ! বাড়ি খালি। আমি একা। চতুর্দিকে ছড়ানো স্মৃতি। বসে আছি প্রেতের মতো। এই সময় কারো দুষ্ট পরামর্শে একটি মেয়ে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করল নানা ছল-ছাতুরি করে। মেয়েটি খারাপ ছিল না, তার মা ছিল সাংঘাতিক। দেখেশুনে এমন একজনকে বিয়ে করেছিল, যে বউয়ের কথায় ওঠে, বসে। আর একটু হলেই ফাঁদে পড়তুম। কুৎসা রটত। বেশ ভালো করে একটা তালা লাগিয়ে কেটে পড়লুম। এক জমিদারের ছেলেকে সেই সময় পড়াতুম। বড়লোক হলেও যথেষ্ট শিক্ষিত, ভালো মানুষ। বাড়িতে বিরাট লাইব্রেরি। সারাদিন পড়তেন। গবেষণামূলক প্রবন্ধ, বই লিখতেন। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে। আমাকে বলতেন, তুমি রোজ আমাকে পড়ে শোনাবে। গঙ্গার ধারেই তাঁর বিরাট বাড়ি। যেদিকটা খুব নির্জন, সেই দিকের একটা ঘরে আমাকে থাকতে দিলেন। পশ্চিমে গঙ্গা, লাগোয়া বারান্দা। অনেক রাত পর্যন্ত বসে গঙ্গা দেখি। ওপারে একটা জুট মিল। কোয়ার্টার। আলোর সারি। হোরমিলার কোম্পানির স্টিমার কখনো কখনো এদিক থেকে ওদিকে চলে যাচ্ছে। ভোঁ ভোঁ সিটি। থমথমে অন্ধকার রাত। স্টিমার-কাটা ঢেউ ঘাটে আছড়ে পড়ছে। ছাৎ, ছাৎ শব্দ। সেই সময় কেউ আমাকে ডাকত, বিমান, বিমান! চুপ করে বসে আছিস কেন? চলে আয়। কখনো কখনো এক লহমার জন্য আমার ওই ঘরে দেখতে পেতুম, গলায় দড়ি দিয়ে কে যেন ঝুলছে। ভূত-প্রেত আমি বিশ্বাস করি না। ভয় থেকেই ভূত জন্মায়; এই ব্যাপারটা আরো কিছু দূর এগোল। একদিন ভর সন্ধ্যাবেলা চুল এলো করে এক সুন্দরী তরুণী হঠাৎ ঘরে এসে ঢুকল। আমি কে, কে করে উঠলুম। গ্রাহ্যই করলে না। ওই এস্টেটের ম্যানেজার আমার থাকাটা পছন্দ করছিলেন না। ভাবলুম, ভদ্রলোক মেয়েটিকে কায়দা করে ঘরে ঢুকিয়েছেন যাতে আমার নামে বদনাম রটানো যায়। ঘরে একটা লাঠি ছিল, সেইটা তুলতেই মেয়েটি অদৃশ্য হল। দরজা বন্ধ করে ফিরে তাকাতেই অবাক, মেয়েটি আমার খাটে বসে আছে। মাথায় খুন

চেপে গেল। লাঠিটা তুলেছি। বসে থাকা অবস্থাতেই ধীরে ধীরে বাষ্পর মতো মিলিয়ে গেল। তখন আমি ভয় পেয়েছি। ওদিকে রাধা-গোবিন্দের মন্দিরে আরতি শুরু হয়েছে। কোনোদিন যাই না, সেদিন আমি প্রায় ছুটতে ছুটতে মন্দিরে গেলুম। গিয়ে দেখি বাড়ির মেয়েদের দলে মিশে ওই মেয়েটিও দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপারটা কি হল! মনের ভুল, চোখের ভুল! কাকে জিজ্ঞেস করব। বড়লোক, বিশাল বাড়ি। অহংকারী মেয়ের দল। ভুরু কুঁচকে তাকান, ক্যাট ক্যাট কথা। ভীষণ, ভীষণ সুন্দরী। মহা সমস্যা! ওই ঘরে একা রাত কাটাবার সাহস আর নেই আমার। বাগানের মালি ভোলাদা আমার একমাত্র বন্ধু। পাঁচিলের ধারে গঙ্গার দিকে লতায় পাতায়-ঘেরা একটা চালায় থাকে। ভোলাদাকে বললুম, 'ভোলাদা...।' সব শুনল। বললে, 'হুঁ আছে। সে আসে। কি একটা বলতে চায়। এই সব বড় বড় বাড়িতে কত কাণ্ড ঘটে গেছে! আরো কত ঘটবে ভাই! ঠিক আছে, আমি তোমার ঘরে শোবো। আমার কিন্তু নাক ডাকে!'

'তোমার এই জীবনকাহিনির মধ্যে নতুন কি আছে? সেই এক গল্প!'

'আছে। আর একটু এগোলেই আছে। আমার মন বললে, একটা খুন হয়েছিল এখানে। বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল একজন। কে সে? কি বলা হয়েছিল তখন? পাঁচিলের বাইরে দক্ষিণদিকে পুরোহিতের পরিবার। তিনটে চালা। উঠান। বটের ছায়া। বকুল, কদম, চাঁপা। সাধারণ ঘণ্টানাড়া পুরোহিত নন। পণ্ডিত। মুখোপাধ্যায় বংশ। পূর্বপুরুষ ভাটপাড়ায় এসেছিল কান্যকুব্জ থেকে সেই কবে। আমি রোজ সংস্কৃত পড়তে যাই। খুব স্নেহ করতেন।'

'তাঁর সুন্দরী একটি মেয়ে ছিল। বয়স সতের। কালো কুচকুচে চুলে এতখানি একটা খোঁপা। ঝিনুকের মতো কপাল, লাল করমচার মতো ঠোঁট। সুঠাম দেহ। মাখনের মতো শরীর। উন্নত স্তন। মরালগ্রীব। যখন চলে যায়...।'

'আপনি কি করে জানলেন?'

'তোমার গল্পের দাবি। এর বাইরে যাওয়ার উপায় নেই—রেললাইনের রেল।'

'আপনি কি বিশ্বাস করছেন না?'

'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা কেন আসছে? জীবনটাই তো গল্প। কিছু এখুনি ঘটে, কিছু পরে ঘটে, কিছু আবার ঘটেই না, চিন্তাতেই থেকে যায়। আমার জীবনে এমন কিছু ঘটল যার ফলে আজ আমি এখানে। তুমি কেন এখানে? ঘটনায় ঘটনায় তাহলে এমন কিছু আঘাত থাকে, যার পরিণতিটা এক। একটু কঠিন হল, তাই না? উদাহরণ—ধরো তুমি ওই পাহাড়ের মাথা থেকে খাদে পড়লে, মরে গেলে। আর আমি সাততলা বাড়ির ছাদ থেকে পড়লুম, মরে গেলুম। তাহলে অঙ্কটা কি হল—পতন ও মৃত্যু। ধাক্কা। ঠেলা। ফল এক। আমি যে কারণে সব ছেড়ে এলুম, তার মধ্যে একটা ধাক্কা ছিল। তুমি এলে, সেও এক ঠেলা! অদৃশ্য একটা হাত। সেই হাত বড় সাংঘাতিক! মাথা নিচু করে চোখ বুজিয়ে বসে থাকো। মাঝে মাঝে আকাশের দিকে মুখ তুলে মা, মা বলো। বলো, আমি তোমার সন্তান। যে ভাবে রাখবে, যেমন রাখবে বহুত আচ্ছা। অহংকার ঔদ্ধত্য একটা লোহার দেয়াল। শোনো, অত হিসেব-নিকেশ, অঙ্ক কষার কি দরকার। ঝড়ের এঁটো পাতা হতে হবে। তোমার কথা আবার রাতে শুনব।'

'আপনার কাছে আছি, কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'এই দেখ, একেই বলে অভিমান। অভিমানে মানুষ ক্ষুদ্র হয়ে যায়। একটা গাছের ডাল জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে এলে, কোনো অস্বস্তি বোধ করে? বহাল তবিয়তেই থাকে।'

'তার বোধ নেই।'

'কে বলেছে? প্রাণ থাকলেই বোধ থাকবে।'

'বোধ থাকলেই অভিমান থাকবে।'

'উঃ, তুমি একটা আবর্তে পড়েছ। এটা অহংকারেরই একটা রূপ। তোমার কি এমন আছে, যে এত অহংকার?'

'কিছুই নেই। এই দুনিয়ায় কার কি আছে? সামান্য একটা মশালের আগুনে বিরাট একটা রাজপ্রাসাদ ছাই হয়ে যেতে পারে! জরির কিংখাবের মধ্যে মহারাজার দেহ প্রাণহীন হয়ে যেতে পারে। সোনার সিংহাসনে রাজ-পোশাকধারী মহারাজা কখন মারা গেছেন অমাত্যেরা জানেন না। তাঁরা 'জাঁহাপনা, জাঁহাপনা' বলে আর্জি পেশ করে চলেছেন। রাজা তাকিয়ে আছেন, কথা বলছেন না।'

'ওহে বৎস! তবু 'আমি' মরে না। ছাই ঘাঁটলে ওই 'আমি'টাই বেরিয়ে আসবে।' 'এ কি রে? তুই এখনো মরিসনি!' 'আমি অমর!' তোমার মধ্যে 'আমি' আছে, থাকবে। সব 'আমি' মরে যাওয়ার পর সেই এক 'আমি' বেঁচে থাকবে। সৃষ্টি আর বিসৃষ্টি। আমরা বসে বসে মুহূর্তের মালা গাঁথি। একটার পর আর একটা নতুন। আঙুলের ডগায় 'যাওয়া আর আসা।' বাজে বকে লাভ কি? মালিকের হাতে সব! তিনি যেদিন ইস্তফা দেবেন, সেদিন কি হবে? জানি না। কেউ জানে না? তাহলে? এই যে দেখছ পথটা, দু'পাশে পাহাড়ের দেয়াল, ওপরে উঠে গেছে। একেবারে শেষে একটা ভোজনালয়। একটি পাহাড়ি পরিবার। গরম রুটি, গরম ডাল, গরম দুধ। নেশাও পাওয়া যায়। দোকানের পেছনে আশ্রয়। একা মনে হলে সেবিকা। তবে, পকেটে মাল থাকা চাই। সেটা আসবে কোথা থেকে।

'আমার পূর্বপুরুষ কিছু রেখে গেছেন।'

'আমার পূর্ব সঞ্চয়। সে এমন কিছু নয়। এর পর?'

'জানি না।'

'কে জানে?'

'তাও জানি না।'

'আজকের দিন শেষ হয়ে এল। কাল একটা সোনালি রাঙতায় মোড়া নতুন দিন। জগতের উপহার। বিনামূল্যে। আমরা শুরু করব 'মাইনাস ব্যালেন্সে'। জীবন থেকে দিয়েছি চব্বিশটা ঘণ্টা। আর পকেটের পুঁজি খরচ করেছি ঘণ্টা বাজাবার জন্যে। চলো, এইবার চড়াই ভেঙে যাই রুটির সন্ধানে।'

'এখনি? আর একটু বসুন না!'

'আমাদের ডেরায় আবার ফিরতে হবে তো!'

'সে তো একটু পথ।'

'কিন্তু দুর্গম। পাহাড়ে তুমি এখনো অভ্যস্ত হওনি।'

'হয়ে যাব। আর একটু বসুন। কাল রাতে দুটো স্বপ্ন দেখেছি। প্রথমটা ভয়ংকর। ভোলা মালি আমার বুকে চেপে বসেছে। হাতে একটা ভোজালি।'

'কেন দেখলে? ওই বাড়িতে একমাত্র তার সঙ্গেই তো তোমার মনের কথা হত?'

'সে হত; কিন্তু আমি আমার অনুসন্ধানে জেনে ফেলেছিলুম, ওদের বাড়ির পুরনো আস্তাবলের পেছনে একটা ঢিবির তলায় একটা দেহ পোঁতা আছে। মাটি ভেদ করে গুচ্ছ গুচ্ছ চুল বেরিয়ে পড়েছে বছরের পর বছর বৃষ্টির জলে মাটি ধুয়ে যাবার ফলে। ভাবছি, কোনো গাছের শেকড় না কি! উবু হয়ে বসে সাহস করে টেনে টেনে দেখছি। গাটা কেমন যেন রি রি করে উঠল। শেকড় তো এমন হয় না। হঠাৎ পেছন দিক থেকে কাঁধের ওপর একটা হাত এসে পড়ল। চমকে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি ভোলা। ভয়ংকর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। গলার স্বর অন্যরকম। 'এখানে কি করছ? উঠে এস। সাপ-খোপের আড্ডা। কবেকার কোন গাছের শুকনো শেকড়ের জাল।' গলার সুর পাল্টে মিষ্টি করে বললে, 'গঙ্গার দিকে বাগানে ঘোরো। এক সময় এই আস্তাবলে ঘোড়া থাকত। মাটিতে যত বাজে জিনিস ঢুকে আছে। হঠাৎ এদিকে এলে কেন।' আস্তাবলের মেঝের এদিক-ওদিকে ঘোড়ার পায়ের কয়েকটা নাল পড়েছিল। মাথায় খেলে গেল, 'নাল খুঁজতে এসেছিলুম ভোলাদা। মস্ত বড় এক তান্ত্রিক আমাকে বলেছেন, মাথার বালিশের নীচে রাখলে সব কাজে সাফল্য।' আমি একটা তুলে নিলুম। ভোলা বিশ্বাস করেছে বলে মনে হল না। কিছুক্ষণ পরে দেখি ভোলা আর একটা লোক কোদাল দিয়ে মাটির ওপর মাটি চাপিয়ে ঢিবিটাকে উঁচু করছে। বুঝে গেলুম ব্যাপার সুবিধে নয়। আমি একটা গোপন সূত্রের সন্ধান পেয়েছি। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে দিল, আর দেরি না করে পালাও। রাতে ভোলা তোমার গলা টিপে বস্তায় ভরে গঙ্গার জলে নিশুতি রাতে ফেলে দেবে। গোটা- কতক পাথর ঢুকিয়ে দেবে। একেবারে তলায় চলে যাবে। আমার কেউ কোথাও নেই। খবর নিতে আসবে না। আমি পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়িতে গেলুম। তিনি সব শুনে বললেন, আমার কাছে থাক। আমার ছেলে নেই, একটি মাত্র মেয়ে, তুমিই আমার ছেলে। কারোকে কিছু না বলে আমি চলে এলুম। ভারি পবিত্র জায়গা। তুলসীর বাগান। গঙ্গার বাতাস। সারাদিন জ্ঞানের চর্চা। মনে হত, আমি কোনো তীর্থে এসেছি। পণ্ডিতমশাইয়ের মেয়ের নামও তুলসী। অসাধারণ মেয়ে। মায়ের শরীর ভালো নয়। থেকে থেকে জ্বর আসে। বোধহয় ম্যালেরিয়া। মেয়ে সংসারটাকে মাথায় করে রেখেছে। বাড়ি নয় আশ্রম। ঝকঝকে পরিষ্কার। ছবির মতো সব গোছানো। স্বপ্নে তুলসীকে দেখলুম। তুলসীবেদিতে সন্ধ্যায় প্রদীপ রেখে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করছে। আমাকে দেখে বললে, একি দাঁড়িয়ে কেন, প্রণাম কর। প্রণাম করে উঠে দেখি কেউ কোথাও নেই, সব ফাঁকা, আমি দাঁড়িয়ে আছি একা।'

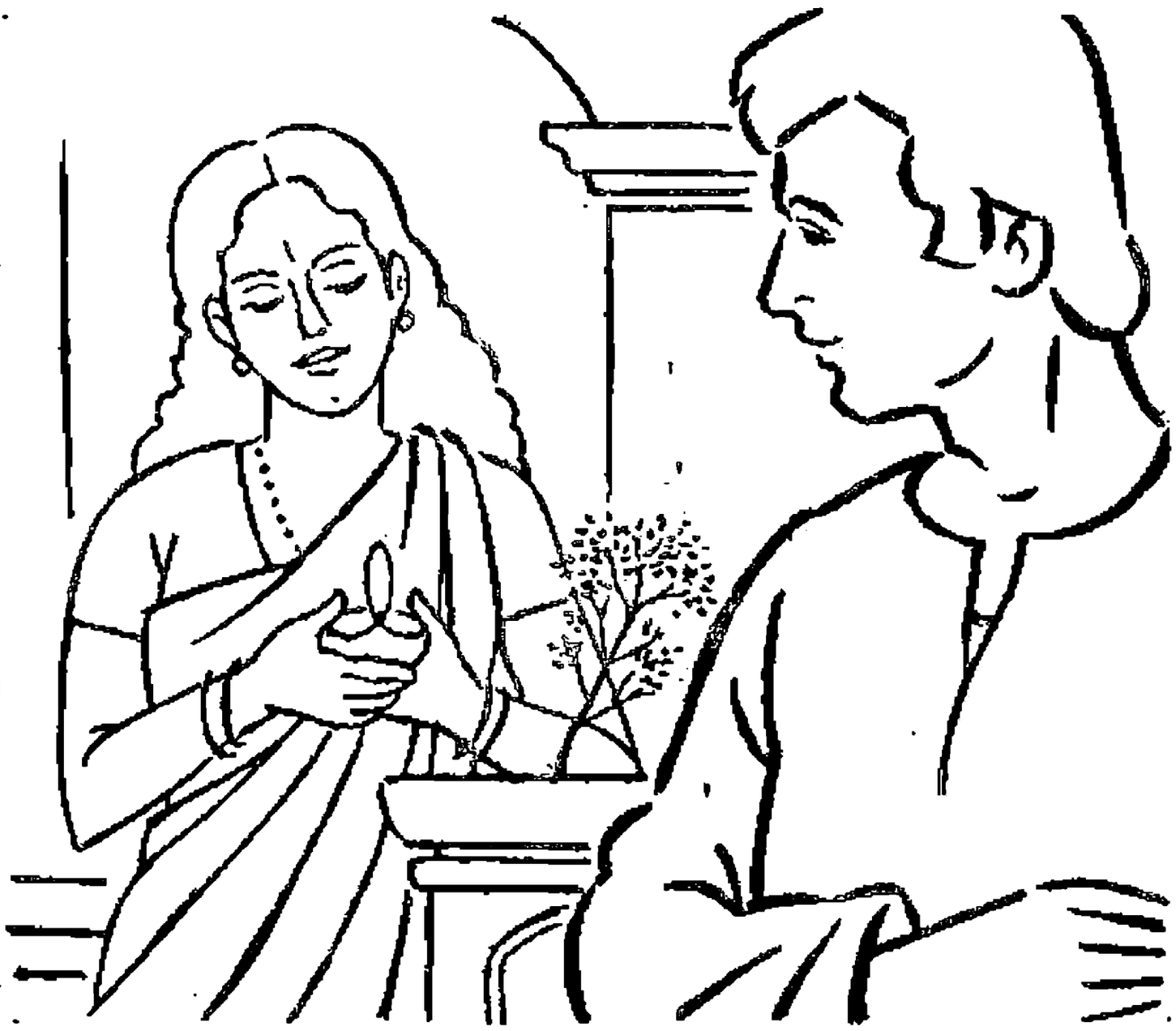

স্বপ্নে তুলসীকে দেখলুম

'তুলসীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে সুন্দর একটা সংসার করতে তোমার আপত্তিটা কোথায়?'

'সংসার মানেই ঝামেলা। আমি পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হব, দেশ-দেশান্তরে, পাহাড়ে, পর্বতে ঘুরে বেড়াব। নদীর তীরে বটগাছের তলায় বসে ধ্যান করব।'

'ইচ্ছাটা থাকা ভালো, তবে কতদিন থাকবে, সেইটাই হল কথা। জীবন এক জটিল ব্যাপার। শোঁয়াপোকার মতো অনেক শোঁয়া। কতদিকে কতভাবে জড়িয়ে যাবে, তার কোনো শাস্ত্র নেই। অঙ্ক নেই, পদ্ধতি নেই সমাধানের। একটা কিছু ঘটালেই, তার ফল গড়াতে গড়াতে চলল ঘটনার পর ঘটনায়। ঘটে যাওয়া ঘটনাকে প্রয়োজনে অন্যরকম করা যায় না। একটা লেখা মুছে ফেলে অন্যরকম লেখা যায়। ঘটনাকে মেরামত করা অসম্ভব। জান না তুমি, বাইরে থেকে দেখছ, তাই আমার ভেতরটা তুমি দেখতে পাচ্ছ না, আমি খুব কামুক। সেই অর্থে অমি চরিত্রহীন। কিছুতেই নিজেকে সংশোধন করতে পারছি না। একটু আগে যেখানে আমরা

খেতে গেলুম, সেখানে দেখলে ঘাগরা পরা একটি মেয়ে চাপাটি সেঁকছে।'

'দেখেছি।'

'কিছু মনে হয়েছে?'

'তুমিও বলনি, আমিও বলিনি। বসে বসে এমন বিষয়ের আলোচনা করতে চাইছি, যা আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। ঊর্ধ্বলোকের। সাধকরা যাকে বলছেন দেবলোক। দেখ, শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের একটি কথা বলেছিলেন, যে খায়দায়, আনন্দ করে, যার মনে স্বাভাবিক ভাবেই কোনো বাজে চিন্তা আসে না, একেবারে স্বাভাবিক, সে খুব ভালো, আমি তাকেই পছন্দ করব। ভণ্ডদের আমি আমার ত্রিসীমানায় আসতে দেবো না। আমি নিজে কেমন জান, খাই, দাই থাকি, আর সব জানেন আমার মা, মা কালী।'

'দেখুন, আপনাকে আমি চিনেছি। আমার ঘুম পাতলা। কাল মাঝরাতে আপনি বিছানায় বসেছিলেন ধ্যানস্থ। শরীর ঘিরে একটা আলো। টেলিফোনে কথার বলার মতো কারো সঙ্গে কথা বলছিলেন। সে সব কথার অর্থ আমার দুর্বোধ্য। সব আলোচনায় আপনি নিজেকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করে ফালা ফালা করেন। একজন সার্জেন নিজেকে কাটাছেঁড়া করতে পারেন না। আপনি এমন সার্জেন যে নিজেকে টেবিলে শুইয়ে ছুরি চালায়। আপনার লক্ষ্য কিন্তু সে, যাকে আপনি বলছেন। আপনি হলেন সেই রাঁধুনি—যে হাত পুড়িয়ে রান্না শিখেছে। সাংঘাতিক মানুষ আপনি। আপনাকে একটা সত্য কথা বলি, তুলসীর সামনে আমি আর কোনোদিন গিয়ে দাঁড়াতে পারব না। আমি আমার মুখ পুড়িয়েছি।'

'কি করেছিলে?'

'আমি আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তার স্নান করা দেখতুম বিভোর হয়ে। একদিন ধরা পড়ে গেলুম। স্পষ্ট বললে, 'ছি, ছি, তুমি খুব নোংরা ছেলে।' তুলসী সন্ধ্যাদীপের পবিত্রতা, আমি নোংরা নর্দমা। আমি তাকে বলে এসেছি, 'যদি শুদ্ধ হতে পারি তবে তোমার সামনে এসে দাঁড়াব।' কিন্তু এখনো আমার পরিবর্তন আসেনি। বদমাইশ লোফারটা ভেতরে বসে আছে। দিনে দিনে পুষ্ট হচ্ছে। আমার শরীরটা ব্যবহার করতে চাইছে। আমার প্রভু হয়ে উঠতে চাইছে। আমি প্রেমিক। আমি ভালোবাসতে চাই। যথাসর্বস্ব দিয়ে দিতে চাই। কোথায়? আমার প্রেমিকাকে আমি খুন করেছি। ওপরের ওই পথটা ধরে আমি ঊর্ধ্বে, আরো ঊর্ধ্বে উঠে যাব। বরফের রাজ্যে হারিয়ে যাব। মরে যাব। দেহটা বরফের স্তরে চাপা পড়ে থাকবে। অনেক অনেক দিন। ভগবান আমি চাই না। কি হবে? আমি প্রাণের মানুষ চাই। তার সুখেই আমার সুখ। আমার ভালোবাসা হবে সেবা। আমি একটা ইডিয়েটের মতো কথা বলছি হয় তো। মাথামুন্ডু নেই; কিন্তু বলছি। আপনি বলেই বলছি। আমার চোখে আপনি এক রহস্য। কলকাতায় আপনার বক্তৃতা আমি শুনেছি। মোহিত হয়ে শুনেছি। একটা বক্তৃতায় আপনি বলেছিলেন, 'পাপও নেই পুণ্যও নেই, আছে মানুষ ও তার কর্ম। ভগবান কিছুই তৈরি করেননি। এই পৃথিবীটা ছাড়া সবই মানুষের সৃষ্টি। মানুষই শেষ কথা। মানুষের শাসন, মানুষের ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে মানুষের বাঁচা, মরা, ভালো থাকা। মানুষের স্বাধীনতা কোথায়! বাইরে দাসত্ব, ভেতরেও দাসত্ব। সেখানে তার ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে তার স্বভাব। মানুষ সব জানে, নিজেকে জানে না। সেই প্রথম মানুষটা কোথায়, যার থেকে এত এত মানুষ, আসছে তো আসছেই অবিরল ধারায়। সে ভালো ছিল না খারাপ, পাপী ছিল, না পুণ্যবান। সে পুরুষ ছিল না, নারী! একজন নয় দুজন। একটি বীজের মতো। কেউ জানে না, প্রথম আদিতে কি হয়েছিল? শুধু অনুমান, কল্পনা। আমি চিরকালে হারিয়ে গেলুম। হারিয়েই থাকব রহস্যের রহস্য হয়ে।'

'চুপ, চুপ। অকারণে বকছ। আমাদের প্রতিদিনের বেঁচে থাকার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। জীবন সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। চিরকালের লড়াই। দেহ হল সিংহাসন, রাজা হল একটা 'আমি'। লক্ষ্য হল, দখল। কে কতটা আদায় করে নিতে পারে, অর্থ, বিত্ত, প্রতিপত্তি। একজনের আর-একজনকে টপকে যাওয়া। এত কথা বলার কি আছে? কত রকমের, ধরনের কামনা-বাসনা! সে তুমি চাইছ, না তোমার ইন্দ্রিয় চাইছে এসব জেনে কি হবে! একটা বিরাট কিছু আছে, অবশ্যই আছে; তা থাকে থাক। এইবার আমি একটু বসি, সেই রুটির দোকানের মেয়েটাকে ধ্যানে আনি। তার দেহটা খুব আকর্ষণীয়, দেবীমূর্তি। তার স্বভাব, কণ্ঠস্বর, আচার-আচরণ আমার জানার দরকার নেই। আচ্ছা। এই মনে করি না কেন, সেই আমার রাধিকা। তুমিও তোমার সিক্তবসনা তুলসীকে ধ্যান কর। বৈষ্ণবের রাধা-কৃষ্ণ, শাক্তের শিব-শক্তি, উমা-মহেশ্বর। ধ্যানের আকর্ষণে সে আসবেই। জগতটা গুটিয়ে এতটুকু হয়ে মুক্তোর মতো ঢুকে যাবে ঝিনুকের খোলে। সমুদ্রের অতলে যেখানে কোনো ঢেউ নেই, শুধুই স্তব্ধতা, নীল প্রশান্তি স্বচ্ছতা, সেইখানে পড়ে থাকি বাকি রাতটা। তুমিও বসে থাক শিব হয়ে তোমার উমাকে কোলে নিয়ে। ধীরে ধীরে গলতে থাকে, হয়ে যাও একটি যৌগ। কাম না থাকলে প্রেম আসবে কোথা থেকে? সে যেন বন্ধ্যার প্রসব ব্যথা! হ্যাঁ গো, আমাকে একটাই গাইবার অনুমতি দেবে?'

'অবশ্যই।'

'তানপুরা ছাড়তে পার?'

'পারি।'

'ওই যে কোণে, দাঁড় করানো। নিয়ে এস।'

'আপনার গান আমি একবার শুনেছি।'

'বেশ করেছ, এখন এই গানটা মন দিয়ে শোনো। গানের বাণী—

পাবি না ক্ষেপা মায়েরে ক্ষেপার
মতো না ক্ষেপিলে,
সেয়ান পাগল বুঁচকিকাল, কাজ
হবে না ওরূপ হলে।।
শুনিসনে তুই ভবের কথা
এ যে বন্ধ্যার প্রসব ব্যথা,
সার করে শ্রীনাথের কথা চোখের
ঠুলি দে না খুলে।।
মায়া মোহ ভোগতৃষ্ণা দেবে
তোরে যতই তাড়া,

বোবার মতো থাকবি, সে কথায়
না দিয়ে সাড়া
নিবৃত্তিরে লয়ে সাথে ভ্রমণ কর
তত্ত্বপথে
নৃত্য কর প্রেমে মেতে, সদা
কালী কালী বলে।

'তোমার হাই উঠছে। ঘুম পেয়েছে।'

'রাতে ঘুম আসতে চায় না। একটা ঘোর আসে। আর কেবলই এক দৃশ্য স্পষ্ট হতে হতে অস্পষ্ট হচ্ছে, আবার স্পষ্ট হচ্ছে। এই চলতে থাকে সারাটা রাত।'

'দৃশ্যটা কি?'

'সেই এক দৃশ্য, শয়নে-স্বপনে। তুলসীমঞ্চের সামনে সন্ধ্যাদীপ হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে এক দেবী। অন্ধকারে একটি আলোর বলয়। কোথাও আর কিছু নেই। বড় একটা গাছের শাখা ঝুঁকে পড়ে দেখছে। ফুটে আছে ধবধবে সাদা একটা ফুল। দুধের মতো সাদা আলো। মনে হচ্ছে, পাগল হয়ে যাব।'

'হতে বাকি কি? আমরা সময়ের খাঁজে আটকে গেছি। আমাদের জীবনে কোনো ঘটনা নেই। মৃত সময়ে প্রেতের মতো ঘুরছি। অতীতের অস্থি সংগ্রহ করে করে কফিনে রাখছি। এখন রাত ঠিক দুটো। এইবার আমার গুরু আসবেন।'

'কিভাবে আসবেন, কোথা দিয়ে আসবেন?'

'মুক্তি আর মুক্ত দুটো শব্দ। বদ্ধ আর আবদ্ধ। হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াবেন। ভারতের আকাশ জ্যোতির্ময়। মহাপুরুষদের বিচরণ ক্ষেত্র। দেবতাদের ভ্রমণপথ। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে চলে গেছে আলোর রেখা টেনে টেনে। স্মরণ করো, স্মরণ করো। মুহূর্তে চলে যাবে দেবলোকে। ঘুপচি ঘর, বাসি বিছানা, অপরিচ্ছন্ন নারীশরীর, মদের গন্ধ, ছাড়া কাপড়-জামা, মুরগির হাড়, ভ্যাপসা গরম, দুর্গন্ধ! এরই নাম নরক। কামকীটের ভারি পছন্দের স্থান। অন্ধকার আকর্ষণ। কেঁচোর মাথা তোলা। তুলছে, আবার লটকে একপাশে পড়ে যাচ্ছে। মাংস আর মেদের খাঁজে ঢুকে যাচ্ছে। অবিদ্যা, মায়ার সন্তান দল পৃথিবীটাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে। লোভের জিভ লকলক করছে। এদের প্রশ্বাসে সব কালো হয়ে যাচ্ছে। জীবন নিয়ে, ধর্ম নিয়ে ন্যাকামো করো না। উত্তর দিকে মুখ করে, চোখ বুজিয়ে বোসো। ঘুমিয়ে পড়ো না।'

।। তিন।।

'এই যে দেখছ পথটা, এটা ক্রমশ ওপর দিকে উঠে গেছে। আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। বড়-ছোট পাথরের স্তূপ। মাঝে মাঝে জল চলে আসছে অদৃশ্য সব উৎস থেকে। এটা তীর্থযাত্রীদের পথ নয়, সাধুদের পথ। এইটা পেরোতে পারলেই অদ্ভুত এক চাতাল। সেখান থেকে মাথা তুলেছে ওই বিরাট পাহাড়টা। উঁচু, কত উঁচু, যেন আকাশে ঠেকে গেছে। ওই পাহাড়ে একটা বড় গুহা আছে। সেই গুহায় ধ্যানস্থ এক সাধু। তাঁর পার্থিব শরীর কতটা প্রাচীন, কেউ বলতে পারবে না।'

'আপনি আগে গেছেন?'

'অনেকবার।'

'কথা হয়েছে?'

'না, একবার শুধু তাকিয়েছিলেন। সে দৃষ্টি আমি সহ্য করতে পারিনি। অন্তর্ভেদী।'

'আমি কি উঠতে পারব? এ তো দুর্গম!'

'আমি পারলে, তুমিও পারবে। শরীরটা হালকা করে নাও।'

'কি করব? হালকা? কেমন করে করব?'

'শ্বাস নিয়ে ধরে রাখ, কুম্ভক। দেখবে শরীর হালকা হয়ে গেছে। আগেই ভাববে না, পারব না। ভাববে, এ আমার পক্ষে কিছুই নয়। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে থাকবে। এপাশে-ওপাশে গাছের শেকড় ঝুলে আছে। সাহায্য নিতে পার। কখনো পাহাড়ে উঠেছ?'

'না!'

'এই তোমার প্রথম। আমি তোমার পেছনেই আছি। আজকের দিনটা খুব সুন্দর। রোদ ঝলমলে। দূরের পাহাড় সব ঝকঝক করছে; যেন এক একজন দেবতা। শিব শিব বলতে বলতে ওঠ। হিমালয় হল শিবভূমি! পৃথিবীতে অনেক বড় বড় পাহাড় আছে, পাহাড় দেবতা কোথাও নেই। এ হল ঋষিদের অবদান। দেবতারা এখানে মানুষকে কৃপা করে আসতে দেন। সাহায্য করেন। সে-ই আসতে পারে যার সংসার বন্ধন ঘুচে গেছে। এ-পথ গাড়ি-ঘোড়ার পথ নয়, পায়ের পথ। এই দেখ, তুমি কত সহজে উঠে এলে। কিছু বুঝতে পারলে?'

'আমি উঠিনি। উঠেছেন আপনি।'

'আমিও উঠিনি। উঠেছেন তিনি।'

'তিনি? তিনি কে?'

'যে যেমন বোঝে। শক্তি, শক্তি। মা আর বাবার একত্র শক্তি। জগতের আড়ালে কেমন বসে আছেন। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় আলোর খেলা খেলছেন। মুঠো মুঠো ছুঁড়ে দিচ্ছেন মহাকাশে, গ্রহ, চন্দ্র, তারা। ঐ দেখ, দেখ। তোমার কি ভাগ্য! গুহার বাইরে তিন দেবশিশু। আজ এসেছে, আজ এসেছে।'

'আশ্চর্য!'

'তুমি দেখতে পাচ্ছ তো?'

'ওই তো। কোথা থেকে এল?'

'গুহার ভেতরে বসে আছেন যে সাধক, তাঁর শরীর থেকে বেরিয়ে এসেছে তিনটি কাল—অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। তিনটিই শিশু। দেহ দিয়ে আমরা কাল মাপি—আমার শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য। আসলে এ-সব কিছুই নেই। স্তব্ধ বিশাল মহাকাল। তিনি চির কিশোর। ওই দেখ, তিনজনে কেমন বিশাল চাতালে মহানন্দে ছোটাছুটি করছে।'

'এ কি সম্ভব?'

'অবিশ্বাস, অবিশ্বাস! সস্কারে বহু জন্মের সংসারী মানুষের প্যাঁচ। ভেতরটা জট পাকিয়ে আছে। এস তোমাকে আমি এই পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে ঠেলে ফেলে দি। আমি খুনি। এখানে কেউ নেই। ওই দেখ, তোমার মুখটা ভয়ে কেমন যেন হয়ে গেল। শোনো, যে মানুষ সত্যকে জেনেছে সে খুন হয়ে গেছে। তার আর কোনো বোধ থাকে না, মরে গেছে, না বেঁচে আছে! কি চাও তুমি? আমার সন্ধান তোমাকে কে দিয়েছে?'

'এই প্রশ্ন আপনার কাছ থেকে আশা করিনি। সন্ধান দিয়েছেন ভগবান।

আপনার বিশ্বাস এখনো পাকা হয়নি। কিছু অলৌকিক শক্তি পেয়েছেন, এই মাত্র।'

'অ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ। একেবারে ঠিক। তুমিই তাহলে আমার গুরু।'

'আবার ভুল করলেন। একমাত্র গুরু ভগবান, সচ্চিদানন্দ। কেউ কারো গুরু নয়। তিনি যাকে কৃপা করবেন, যখন করবেন।'

'বাঃ বাঃ, এই তো, এই তো, আমার সন্দেহে তোমার বিশ্বাস বেশ পাকা হয়েছে। তুমি এই জ্ঞান পেলে কার কাছ থেকে? তুমি আলোকিত হয়েছ। তিনি একই সঙ্গে জ্ঞানী ও ভক্ত।'

'তিনি বেলুড় মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসী। তিনিই আমাকে শ্রীরামকৃষ্ণের জগতে নিয়ে গেছেন। তিনি কত সহজ, কত উদার! আমি ওই মহাপুরুষের আশ্রয়ে বেশ কিছুদিন ছিলুম। সন্ন্যাসী হতে চেয়েছিলুম। তিনি এক কথায় বলে দিলেন, শান্ত, সুন্দর, পবিত্র গৃহী হও। ঠাকুর চলে যাওয়ার পর গৃহীর বড় অভাব। শ্রীহীন পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। সমাজ দূষিত হচ্ছে। জানি না, তিনি আমার স্বভাবে, সংস্কারে কি দেখেছিলেন জানি না। তবে এও ঠিক, আপনি একেবারে অন্যরকম রহস্যময়। আপনার আসল দিকটা ধরা যাচ্ছে না।'

'আরে আমিই কি জানি কি হয়েছে আমার? আমার তো জেলে থাকার কথা। আমি তো আসামী! এই দেখ তোমার মুখের চেহারা বদলে গেল। ঘৃণার ভাব।'

'ভুল করলেন। আপনার পড়াটা ঠিক হল না। আমি খুনিদের ডেরা থেকে পালিয়ে এসেছি। মিথ্যা অপরাধে আমাকেও ফাঁসানো হত। সে খবরও আমি পেয়েছি। ওই সব বলে আমাকে আর পরীক্ষা করবেন না। একটু আগে পাহাড়ে ওঠার সময় আমি অনুভব করেছি আমি উঠছি না, অদৃশ্য শক্তি আমাকে নিমেষে এই পাথরের চাতালে তুলে দিল। আপনি কোথায় কোন শ্মশানে, কোন গুহায় সাধনা করেছিলেন?'

'তুমি একটি আধুনিক ছেলে, কি সাধনা, সাধনা করছ। ভোগের দুনিয়ায় চুটিয়ে ভোগ কর, বুড়ো হয়ে মরে যাও। আমিও মরে গিয়েছিলুম, এটি একই শরীরে দ্বিতীয় জীবন! ভাবছ গাঁজাখুরি গল্প! তা ভাবতে পার। বিশ্বাস তো মনেরই একটা স্তর!'

'ওই যে বললুম, আপনি এক রহস্য। আমরা গুহায় ঢুকে মহাপুরুষকে দেখব না?'

'এমন কিছু ঘটবে, যাতে তুমি ভীষণ ভয় পাবে। তুমি তাঁর বালক রূপ দেখলে। তিনি কৃপা করে দেখালেন। আজ এই পর্যন্ত থাক। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, তিনি ওই গুহায় নেই, বসে আছেন তোমার পাশে! না না, ভয় পেয়ো না, আশ্চর্য হয়ো না। হতে পারে, এমন হতে পারে। তুমিও তো একদিন বালক ছিলে, সেই বালকটা কোথায় গেল? তুমি খুন করেছ? এই, এই, দেখেছ আমরা সবাই খুনি। অদৃশ্য খুনি। বিচার হবে না কোনো আদালতে।'

'আপনি আমার মাথাটা খারাপ করে দেবেন। এইবার আমার সত্যি সত্যি ভয় করছে।'

'ভয় নেই। তুমি নিরাপদ। এস, বসা যাক।'

'আমরা গুহার ভেতরে যাব না?'

'ভেতরে যাব কেন? ওই তো তিনি এখন পাহাড়চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন, দেখতে পাচ্ছ না?'

'অনেকটা উঁচুতে, ছোট্ট একটা বিন্দুর মতো। ওখানে কেন?'

'ওখানে নয় কেন?'

'ঠিক ঠিক। বোকার মতো প্রশ্ন করে ফেলেছি।'

'আমরা যে স্তরের মানুষ, সেই স্তরে শুধুই কার্য-কারণ। কারণ ছাড়া কাজ অকাজ। উনি ভগবানের মতো নিঃসঙ্গ। সেইটাই উপভোগ করছেন। কেউ কোথাও নেই শুধু আমি আছি। উরেব্বাপরে! ভাবা যায়! পাগল হয়ে যাবে, আত্মহত্যা করে ফেলবে। ভগবানের মন আর মানুষের মনে অনেক তফাৎ। তাঁর ভেতর থেকে হু হু করে কত কি বেরিয়ে আসছে। ওই দেখ, দু'হাত মেলে বুক চওড়া করে কেমন দাঁড়িয়ে আছেন। বড় বড় সাদা চুল, দাড়ি। বাতাসে বুকের ওপর লুটোপুটি খাচ্ছে। দেহ নেই, তাই মৃত্যুভয় নেই।'

'ওটা তাহলে কি?'

'আকার।'

'তার মনে বাষ্প, ধোঁয়া?'

'আলো হতে পারে, ছায়াও হতে পারে। জড়িয়ে ধরলে দেখা যাবে কিছুই নেই।'

'মরীচিকা?'

'তাও হতে পারে। যোগীরা কখন কি করে বসবেন কে বলতে পারে? ওই গুহায় খবরদার ঢুকো না। ওখানে মাঝে মাঝে একটা বাতাস আসে, অজগরের শ্বাস। তোমাকে টেনে নেবে। ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। একদিন আমাকে এই পাথরের ওপর বসে থাকতে বলে আমার গুরুদেব ওই গুহায় প্রবেশ করলেন, আর বেরুলেন না। আমি বসেই রইলুম। তিনটে দিন কিভাবে কেটে গেল। একদিন শেষ রাতে একটা কঠিন আদেশ কানে এল, 'বসে আছিস কেন? যা দেবার দিয়েছি, এবার নিজের পথে এগিয়ে যা। আমার ওই কুঠিয়ায় থাকবি। একদিন ওটাও থাকবে না। তখন পথই বলে দেবে পথ। কালের চিন্তা কালই করবে। আমাদের পথে ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। সময়ের বাইরে যাওয়াই আমাদের সাধনা।' আমি তো সেই জায়গাটায় যেতে পারিনি। ও কি সহজ না কি? দেহ আছে মৃত্যু নেই, জন্ম নেই। এই শরীরটাও তো একদিন জন্মেছিল, একটু একটু করে বেড়েছে। সব কটা ইন্দ্রিয়ের তোড় সহ্য করছে, তাহলে?'

'আশ্চর্য! আপনি আমাকে প্রশ্ন করছেন? আমার কাছে সব কিছুই তো দুর্বোধ্য। আমি জানি, আমি মরার জন্যে জন্মেছি। যে জগতে সবাই বেঁচে আছে, সেই জগতেই আমিও আছি। দিন আর রাত ঘুরে ঘুরে আসছে। বয়েস বাড়ছে।'

'সে ঠিক আছে; কিন্তু, তুমিই বা এখানে কেন? আমিই বা এখানে কেন? ওই হরিদ্বারের গঙ্গার ধার। সম্পূর্ণ অচেনা একজন। ওঠ, চল আমার সঙ্গে। এ পথে অনেকে গেছে। তুমিও চল। এ কোনো মন্দিরে যাওয়া নয়। জগতের

এক স্তর থেকে আর এক স্তরে যাওয়া। যেমন ফলের পোকা! ক্রমশ ঢুকছে। গভীরে, আরো গভীরে। হরিদ্বার যেন উঠান। হাজার মানুষের মিলন। কোনো ভয় নেই। যে মানুষ এসেছিল, সেই মানুষই ফিরে চলল। কিন্তু, ওখানে ফাঁদ পাতা আছে। সেই ফাঁদে পড়লে তোমার মুখ ঘুরে যাবে। জগতের সব শাস্ত্র সেখানে অচল। পৃথিবীর কোনো ঘড়িতে সেখানকার সময় ধরা যাবে না। সবাই চলছে, যাচ্ছে না কোথায়। দেখলে না, গুহা থেকে তিনটি বালক বেরিয়ে এসেছিল।'

'সব, সব আমি শুনছি। কয়েকদিন ধরে শুনছি, আর আপনাকে দেখছি। আপনি 'খাবো' বলে খাচ্ছেন না, 'ঘুমোবো' বলে ঘুমোচ্ছেন না, অথচ কি সুন্দর আছেন! এই অদ্ভুত অবস্থায় এলেন কি করে? এই স্বাধীনতা! এ তো শুনে বা পড়ে হয় না।'

তুমি মরে বেঁচেছ। তোমার নাম কি?

'তা হলে স্থির হয়ে বসে শোনো—কি হয়েছিল? আমি শহর কলকাতার মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। জ্ঞান হওয়া থেকেই শুনছি—লেখা, পড়া, পরীক্ষা, পাশ, চাকরি, টাকা, বিয়ে, ছেলেপুলে, সংসার। এর বাইরে বিশেষ কিছু নেই। দম দেওয়া কলের পুতুল। দম দিয়ে ওই পেটাই করা লম্বা রাস্তায় ছেড়ে দাও। গড়গড় করে চলবে। দম হল টাকা। পালিশ হল গোটাকতক ডিগ্রি। বা, বা, বেশ যাচ্ছে, বেশ যাচ্ছে। তালি বাজাও, তালি বাজাও। গুড বয়, স্বার্থপর বয়, শয়তান বয়। আদর্শ বলে কিছু আছে কি? আদর্শ আবার কি? মেয়ে ধরে, খামচাখামচি করে বেঁচে থাক। দরকার হলে মিথ্যে কথা বলো, ক্ষমতাশালীকে তেল দাও। মোসায়েবি কর। কাজ আদায় হয়ে গেলে স্রেফ ভুলে যাও। এইভাবেই বেশ চলছিল। হঠাৎ একদিন বাস থেকে নামতে গিয়ে মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়ে গেলুম। কেউ আমাকে পেছন থেকে জোরে ধাক্কা মেরেছিল। তারপরে কি হল আমি জানি না। ব্রেক কষার বিকট শব্দ। কিছু চিৎকার। এরপর যখন জ্ঞান হল, দেখলুম, পথের ধারে একটা ঝুপড়িতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছি। একটি মেয়ের মুখ আমার মুখের ওপর ঝুঁকে। আমার ঠোঁটের ওপর ঠোঁট রেখে হাওয়া পুরে দিচ্ছে। চোখ চাইতে দেখে বলল, 'বেঁচে গেছে, বেঁচে গেছে।' সুন্দর ধারাল মুখ, পাতলা, খাড়া নাক, পাতলা ঠোঁট, এলো চুল আমার মুখের ওপর ঝুলে আছে। যুবতী। আমার মাথাটা তার কোলে।

'আমার নাকি প্রাণ ছিল না। পেছনের একটা গাড়ি আর একটু হলেই আমাকে শেষ করে দিত। সবাই মিলে ধরাধরি করে আমাকে তুলে এনেছে। মেয়েটার মধ্যে অলৌকিক একটা শক্তি ছিল। শিবের ভক্ত। প্রত্যেক বছর বাঁক নিয়ে তারকেশ্বরে যায়। তার শক্তির কথা সকলেই জানে। সবাই সমীহ করে। যে-কোনো বিপদে মানুষ তার কাছে আসে। ঝকঝকে দুটো চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। বেশ বুঝতে পারলুম, আমার ভেতরে কিছু আসছে। তার শ্বাসে ছিল কর্পূরের গন্ধ। আমার মনে হল, এই মেয়েটিকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না। আমার নতুন জন্ম হয়েছে। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে আছি। আমাদের মধ্যে কিছু একটা হচ্ছে। আদানপ্রদান। কোনো কথা বলতে পারছি না। শব্দ বেরোচ্ছে না। তাকিয়ে আছি সেই রমণীর দিকে। জ্যান্ত মা দুর্গা। সাদা কাঁচুলি। হালকা নীলরঙের পাতলা শাড়ি। সাজিয়ে দিলে সিংহাসনে মহারানি। কালো কুচকুচে চুল পিঠ ছাপিয়ে কোমর পেরিয়ে গেছে। ধীরে ধীরে উঠে বসলুম। মাথা ঘুরছে। মালভর্তি একটা বড় বস্তায় ঠেসান দিয়ে বসলুম। সারা শরীরে ব্যথা। হাঁটু দুটোয় বেশি লেগেছে। হাতের তালু দুটো জখম। দুজনে মুখোমুখি বসে আছি। দেখছি, শুধু দেখছি। সে জিজ্ঞেস করলে, 'কোথায় থাক?'

কি আশ্চর্য! আমি সব ভুলে গেছি। অতীত মনে পড়ছে না। নাম ভুলে গেছি। জিজ্ঞেস করলুম, 'কি হয়েছে আমার?'

'তুমি মরে বেঁচেছ। তোমার নাম কি?'

এইবার ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম। নাম মনে পড়ছে না। সর্বনাশ! ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঘুসের টাকার পাহাড়। কাগজপত্তর। পকেটে অনেক টাকা। সঙ্গে এমন কোনো কাগজ নেই, যা দেখে বলতে পারি, নামধাম ঠিকানা। মেয়েটি খিলখিল করে হাসছে আর বলছে, 'সাধে লোকে আমাকে নাগিনী

বলে। আমার ছোবলে বিষ আছে। আমার লালার রঙ নীল। মুখে ঢুকলে ঘোর হয়। ভর হয়। আমি কি করব? আমার কি করার আছে? সব বাবার কৃপা।' সেই বললে কি হয়েছিল আমার। এই মেয়েটি সেই সময় রাস্তা পার হচ্ছিল। যে গাড়িটা আমাকে পিষে দিতে পারত, সেটার টায়ার ফেটে গেল। আমাকে ধরাধরি করে এখানে তুলে আনা হয়েছে। বললে, 'কোথায় আর যাবে! আমার সঙ্গে নিমতলার শ্মশানেই চল, এখন সেখানেই আমি থাকব কিছুদিন। তোমার একটা লক্ষণ আমার ভালো লেগেছে, যা খুব কম মানুষেই থাকে। তোমার জিভের ডগাটা চেরা। তুমি যদি কারোকে কামড়াও সে মরে যাবে।' আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। সে বললে, 'তোমার পূর্বজন্মের কোনো একটা তোমার ভেতর এসেছে। যেটা ছিল সেটা তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে।'

ঝুপড়িতে কেউ নেই। সে আর আমি বসে আছি। পেছন দিকে অনেকটা জংলা জায়গা তারপর এক জোড়া রেল লাইন। তারপর জমিটা ঢালু হয়ে গেছে একটা জলায়। একটা ভয়ের জায়গা। তাকালেই মৃত্যুর চিন্তা আসবে। প্রেত-পিশাচে গলা টিপে ধরছে। রক্তচোষা বাদুড় এসে গলায় দাঁত ফুটিয়ে রক্ত শুষে নিচ্ছে। মেয়েটি আমার খুব কাছে সরে এসে বললে, 'আমার সঙ্গে যাবে? তোমার খোঁজ তো ওরা করবেই, তোমার বাড়ির লোক। হাসপাতালে যাবে, থানায় যাবে, কাগজে কাগজে ছবি ছাপবে। তখন তো তুমি ধরা পড়ে যাবে। তা হলে?'

নিজেকে কেমন শিশুর মতো অসহায় মনে হল। পূর্বস্মৃতি একেবারে মুছে গেছে। অন্য স্মৃতি জাগছে। পরিষ্কার ধুতি, গোল গলা ফতুয়া পাঞ্জাবি, কাঁধে পাট করা সাদা চাদর, পায়ে চটি, আমি সেরেস্তা থেকে ফিরছি একটা ফিটনে চেপে। একটা নাম বারে বারে মনে পড়ছে—সুধা। সুধা কে? নদীর ধারে বাগানঘেরা বাড়ি। পাশেই কালীমন্দির। ঘোরটা কেটে যেতেই বললুম, 'আমি তোমার। এমন জায়গায় নিয়ে চল যেখানে আমাকে কেউই খুঁজে পাবে না। কিন্তু তোমাকেও যদি ভুলে যাই?'

'তা ভুলবে না। জ্ঞান ফিরে আসার পর থেকে এইবার যা যা হবে সব মনে থাকবে।'

'নাম কি হবে? ঠিকানা কি হবে?'

'সন্ন্যাসীর ওসব থাকে না।'

'আমি তো সন্ন্যাসী হইনি।'

'হবে।'

যে বস্তাটায় ঠেসান দিয়ে বসেছিলুম তার মধ্যে তুলো আর কাপড় দিয়ে জড়ানো ছিল মড়ার মাথা, হাড়গোড়। পঞ্চমুন্ডি আসনের জিনিসপত্র। সেইটা তুলে নিয়ে বললে, 'চলো। হাঁটতে পারবে?' নিমতলা শ্মশানের উত্তর পাশে একেবারে গঙ্গার ধারে একসার কাঠের গুমটি ঘর। তারপরই যত কাঠ আর বাঁশগোলা। জায়গাটা খুবই অপরিষ্কার। বেশি আলোও নেই, অন্ধকার, অন্ধকার। বাতাসে চিতার গন্ধ, ফুলের গন্ধ, দিশি মদের গন্ধ। ভালোই লাগছে। মনে হচ্ছিল, অনেকদিনের পরিচিত জায়গা। সব যেন চেনা চেনা। মাথাটা ভারী হয়ে আছে। নাকটা থেবড়ে গিয়েছিল। মনে হয় ফুলে গেছে। জোর করে টেনে টেনে শ্বাস নিতে হচ্ছে। অদ্ভুত লাগছিল, আমি কে জানি না, অথচ হাঁটছি, কথা বলছি, গা ছমছম করছে, আবার মেয়েটির খুব কাছে থাকতে ভীষণ ভালো লাগছে। দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল। আলো জ্বলল। ঘরে কিছুই নেই। কাঠের মেঝের ওপর একটা মাদুর পাতা। গঙ্গায় জলের শব্দ। শ্মশানের দিকে বহু মানুষের কলরব। হরিধ্বনি। চিতায় চিতায় কাঁচা কাঠ। ভল ভল করে ধোঁয়া উঠছে। আলো পড়েছে। মহাদেবের জটার কুণ্ডলি। খুব. ক্লান্ত লাগছিল। মাদুরে শুয়ে পড়লুম। মেয়েটি দরজা বন্ধ করে, আলো নিবিয়ে আমার পাশে শুয়ে পড়ল। নিচু গলায় আদেশ করল, 'কেউ আসবে না, জামা-টামা সব খুলে ফেল। রাস্তার ধুলো, ময়লা, রক্ত, জল সব লেগে আছে। আমিও সব খুলে ফেলছি।' তোমাকে অনেকটাই বলে ফেললুম, আর না। এইবার নামার চেষ্টা। ওপর পাহাড়ে মেঘ জমেছে। জোর বৃষ্টি হবে, তখন এই চাতালের ওপর দিয়ে এত বেগে জল ছুটবে, আমরা ভেসে যাব। পাহাড়ে খুব সাবধানে, হিসেব করে চলতে হয়। পদে পদে মৃত্যু। তুমি আগে নাম, আমি পেছনে আছি। ঝুঁকে নামবে না। পেছন দিকে শরীরটাকে টেনে রাখ, একটুও ভয় পাবে না। আমি আছি।'

'গুহার ভেতরে শব্দ হচ্ছে।'

'ভেতরে নয়, জল নামছে। নামো নামো। কুইক, কুইক।'

হড়কে, হড়কে প্রায় ধপাস করে নীচে। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, কোমরে অদৃশ্য একটা দড়ি বাঁধা রয়েছে। রাস্তা ঢালু হয়ে কিছুটা নামার পর আবার ওপর দিকে ঠেলে উঠছে। একেবারে উঁচুতে আমাদের সেই খাবার জায়গা। আকাশ আজ তেমন পরিষ্কার নয়। দূরে গভীর খাদ কুয়াশায় চাপা পড়ে গেছে। ওপরের আলো সব নীচে নেমে এসেছে। পথটা তাই ভীষণ স্পষ্ট। বড়-ছোট পাথরগুলোকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। ঠান্ডাও খুব। যে কথা বলছে, তারই মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। পাশ দিয়ে কে একজন ঘোড়ায় চেপে ওপর দিকে চলে গেল। ধাবার মেয়েদের আজ যেন আরো ফর্সা দেখাচ্ছে। গালগুলো সব টাটকা আপেলের মতো লাল। মেয়েরা সব অপ্সরী। সেই তুলনায় পুরুষরা সব কাঠখোট্টা। মুখগুলো ফাটা ফাটা। কপালে বয়েসের ভাঁজ। মেয়েরা সব দশভুজা। খাটুনির শেষ নেই। নীচের নদীটা আজ রহস্যের আড়ালে। জলের শব্দ বেড়েছে। এক ধরনের সাদা ফুলে কিছু কিছু গাছ ছেয়ে গেছে। একেই বোধহয় বলে মন্দার। কয়েকটা পাখি উঁচু ডালে বসে বিষণ্ণ ডাক ডাকছে।

'আপনি তখন থেকে একেবারে চুপ। কি ভাবছেন?'

'বুঝলে, আমি শেষ আদেশের অপেক্ষায় আছি।'

'সে আদেশ আসবে কোথা থেকে?'

'আসবে, আসবে। ঘড়ির মতো নিষ্ঠাবান, মনোযোগী হতে হবে। এক মুহূর্তের জন্যেও টিক টিক ছাড়ে না। কোনো ফাঁক নেই। সরু একটা সুতোও গলাতে পারবে না।' খড়খড়ে কাঠের

বেঞ্চি। কাঠ খুব পবিত্র। সব কাঠেই আগুন আছে। সবই জলেই স্নিগ্ধতা। আবার বিদ্যুৎও আছে। কিশোরী মেয়েটি দু-গেলাস চা দিয়ে গেছে। রান্নার জায়গায় কর্মযজ্ঞ চলছে। হিমালয়ের মশলায় অন্যরকম সুগন্ধ।

'আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে। আপনি অনেক অতীতের কথা বলেছেন, আপনার সম্পর্কে লোকের ধারণার কথা বলেছেন, জীবিকার কথা বলেছেন। সেও সবই আপনার প্রথম আমি। তারপর বিস্মৃতি। দ্বিতীয় আমির শুরু। ওই স্মৃতি তো মুছে যাওয়ার কথা। মৃত্যুর পর কিছু মনে থাকে না। থাকে জাতিস্মরদের। তা হলে?'

'ঠিক। এ প্রশ্ন তুমি অবশ্যই করতে পার। উত্তরও পাবে, তবে তার আগে আমার কাহিনি আরো কিছুটা বাকি আছে। এখন আমরা দুপুরের খাওয়াটা গরম গরম খেয়েনি। আজ আর বেশিক্ষণ বাইরে থাকা যাবে না।'

জীবনে এক একটা সময় আসে যে-সময় খাবার ঝোঁকটা অনেক কমে যায়। কন্‌খলের বটতলায় নিরঞ্জনী সাধুদের আখড়ার পাশে এই উদাস মানুষটির সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে জীবনটা ক্রমশই পালটে যাচ্ছে। আত্মীয়-স্বজন সকলের কথাই ভুলতে বসেছি। এখন একমাত্র তুলসীই স্পষ্ট। তাও এক তরফা। তুলসী আমাকে মনে রাখবে কেন? ঠিক সময়ে পণ্ডিতমশাই তার বিবাহ দেবেন। পণ্ডিতমশাইয়ের বয়েস হচ্ছে। সংস্কৃত আর কেউ তেমন শিখবে না। টোল উঠে যাবে। জমিদারিও গুটিয়ে আসছে। জমিদারবাড়িটা খুব সুন্দর ছিল। খিলানের পর খিলান। ঘরের পর ঘর। বড় বড় দালান। লম্বা লম্বা বারান্দা। জাফরি। রোদ পড়লে জাফরি মেঝেতে নকশার ছায়া ফেলত। ঘরে ঘরে দামি আসবাবপত্র। সব মেঝেই মার্বেল পাথরের। এক একটা অংশ এতটাই নির্জন, দিনের বেলাতেও ভয় করত। সুন্দর গোপাল-মন্দির, শিবমন্দির, রাধা-মাধব। বাড়িটা কিন্তু পাপে ভরা। গণিকারাও বেশি রাতে আসত কারো কারো লালসা মেটাতে। বেশিরভাগ মানুষই কামুক। ভোলা মালি নয়, ভোলা ভয়ংকর। ফুলের বাগানে রক্তমাখা ছুরি হাতে ঘোরে। ছোটবাবুর যত অপকর্মের সহকারী। মস্ত বড় একটা মিনার্ভা গাড়ি সদরে। সেই গাড়িতে চেপে নায়িকারা আসে। এই ভোলাই হয় তো একদিন তুলসীকে তুলে আনবে, আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একটা ঘর আছে, মদের ঘর। সেই ঘরের মেঝেতে দুপুরবেলায় আমি মাতাল সুন্দরীকে পড়ে থাকতে দেখেছি। মাইনে করা ফটোগ্রাফার ছবি তুলছে। শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশ অনাবৃত করে। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছি। মেঝেতে আমার পা আটকে গেছে। পরে নিজের দুঃসাহসকে তিরস্কার করেছি। ধরা পড়লেই জ্যান্ত কবর। প্রশ্ন করেছি, তোর এত কৌতূহল কেন? উপন্যাস লিখবি?

হঠাৎ এক ঝলক রোদ? চারপাশ যেন খলখল করে হেসে উঠল। কুয়াশা পালাবার পথ পাচ্ছে না। দূরে অন্নপূর্ণা রেঞ্জ। এভারেস্টের চূড়া দেখা যাচ্ছে। পেছন থেকে মাথা তুলে আছে। এ ডাকছে কুংকু, ও ডাকছে কুংকু। হলুদ পোশাক পরা মেয়েটি চরকিপাক খাচ্ছে। এতটুকু বিরক্তি নেই তার। সব সময় একটা সুর গুনগুন করছে। এরই ফাঁকে আমাকে একটা সাদা ফুল উপহার দিয়ে গেল। কাজ করতে করতে দূর থেকে দেখছে। ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি। কিছু বলতে চায় ফোটা ফুলের ভাষায়। আমি বিদেশি হলেও ফুলের ভাষা সর্বত্র এক।

'কুংকু তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছে। ক'দিন থেকে দেখছি। ষোল থেকে কুড়ি বসন্তকাল। তিরিশের পর পাতা ঝরা। তারপর বরফ। শ্বেত ভল্লুক। ঝাপসা কুয়াশা। সব পাতা ঝরে গেছে। আঁকাবাঁকা সরু সরু ডাল। তখন অন্য ভাষা, ভিন্ন সুর। ওকে নিয়ে একদিন বেড়াতে যাবে ওই ওপরে, চমৎকার এখটা জায়গা আছে পাথরের আড়ালে, একেবারে আকাশের গায়ে। হৃদয়ে হৃদয় ঠেকিয়ে নারীর বুকের ভাষা শুনবে। সেই একই কথা আদি থেকে অন্তে।'

'আপনি কবিতা লিখতেন?'

'না, কখনোই না। ভীষণ বিষয়ী, স্বার্থপর, ভোগী।'

'যাক্, নিজেকে চিনতে পেরেছেন! ক'জন পারে!'

কুংকুই খাবার নিয়ে এল। গরম, ধোঁয়া ছাড়ছে। আজ তার সাহস বেড়েছে। যাবার সময় এমন ভাবে ঘুরল, যাতে তার পেছনটা আমার কাঁধে ঠেকে যায়। এ আমার কি নিয়তি! জমিদারবাড়ির মন্দিরে রোজ সন্ধ্যারতির সময় ইচ্ছে করে আমার পা মাড়িয়ে দিত। একদিন আমার জামার পকেটে অজ্ঞাতে একটা কাগজের টুকরো ঢুকিয়ে দিয়েছিল। লেখা ছিল বোকচন্দর। আমার মা নেই। থাকলে জিজ্ঞেস করতুম, মা, ওরা কেন এমন করে!

কুংকু গরম ডাল এনেছে। আকুল করা গন্ধ। যাবার সময় আরো সাংঘাতিক কাণ্ড করে গেল। একটা চামচে ইচ্ছে করে মেঝেতে ফেলল, তারপর তোলার সময় হাঁটুতে হাতটা রেখে ঝট করে তুলে নিল। কিসের ইঙ্গিত! এত বড় একটা পৃথিবীতে ছোট্ট এতটুকু একটা ঘটনা। পৃথিবীতে কত বড় বড় শব্দ; তার মধ্যে ছোট্ট টুনটুনির এতটুকু ঠোঁটের টুইট টুইট শব্দ কান কেড়ে নেয়।

'ঝলমলে রোদই যখন উঠল, আমরা তখন একটু নীচের দিকে নামতে পারি তো?'

'সবই আপনার ইচ্ছে। আমার ইচ্ছে বলে কিছু নেই।'

'যথেষ্ট ভেবেচিন্তে বলছ তো?'

'একেবারে।'

'নীচে ছোট্ট সুন্দর একটা বাজার আছে। পাহাড়ের ওপর থেকে দুধের ধারার মতো ওই যে ঝরনাটা নামছে, ওখানে ভারি সুন্দর ছোট্ট একটা নদী হয়েছে। সেই নদীর ধারে একটা পাহাড়ি গ্রাম। মানুষগুলো খুব ভালো। কত রকমের সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি করে। হাতের কাজ। এখানে মানুষের খারাপ হবার উপায় নেই, উপাদান নেই। কিছু নেশা-ভাঙ আছে। তা থাক। মহাদেবের দান। জায়গাটা আমার ভালো লাগে। ওখানে তন্ত্র আছে। পার্বতীরা আছেন। তাঁদেরই আধিপত্য শাসন। ভৈরবদের হম্বি-তম্বি করার উপায় নেই। মা কালীর তারার রূপ। শিবের বুকে

চড়ে বসে আছেন। বড় রহস্যময় জায়গা। গেলেই বুঝতে পারবে। মহাভারতের যুগে ওখানে কি হত কে জানে!'

প্রায় আধঘণ্টার উতরাই পথ। সত্যই সুন্দর। তাসের ঘর-বাড়ি। সুন্দর সুন্দর রঙ। সরু সরু পথ ভেতর দিকে, নদীটার দিকে চলে গেছে। কলকল, খলখল শব্দ। ছোট ছোট তাঁতে স্কার্ফ বোনা হচ্ছে। অপূর্ব রঙের বাহার। পুরুষের দেখা নেই। মেয়েদের রাজত্ব। চতুর্দিকে শক্তির খেলা।

'এসো, খুব ভালো দেখে একটা স্কার্ফ কিনি।'

'কার জন্যে?'

'তোমার জন্যে।'

'আমি কি করব?'

'দেবে। একজনকে উপহার দেবে। তোমার প্রেমিকাকে।'

'আমার প্রেমিকা? সে কে?'

'তুমি অন্ধ না কি? দেখতে পাও না! তার নাম কুংকু।'

'কি বলছেন আপনি?'

'একটু আগে কি বললে? আমি যেমন চালাব। কুংকুর সঙ্গে তোমার বিবাহ দেবো।'

'এ আপনি কি বলছেন? এদের সমাজ, ভাষা, সংস্কৃতি সব আলাদা। এরা আমাকে গ্রহণ করবে কেন?'

'প্রেমের একটিই ভাষা, একটাই জাত, একটাই বিধান, অভিধান, একটিই কথা, ভালোবাসি। আবির্ভাব মন্দিরে, মসজিদে, গির্জায় নয়, মানুষের অন্তরে, নদীর গর্জন নয়, ছোট ছোট তরঙ্গ, বিরাট বিরাট পাথর, ছোট ছোট রঙ-বেরঙের নুড়ি। ঝড় নয় পাতা কাঁপানো ছোট ছোট বাতাস, তোমার, আমার শ্বাসের মতো। ঘাড় ছুঁয়ে যায়, গলার কাছে খেলা করে। পাতলা দুটো ঠোঁটের তুলি-স্পর্শ, মৃদু দংশন। শরীরে কদম্বের জাগরণ। অত বড় নারায়ণ ছোট্ট একটি শালগ্রাম মানুষের ভালোবাসায়, কুরুক্ষেত্রের গোপাল, যোদ্ধা শ্রীকৃষ্ণ, গৃহমাতার কোলে, চুকচুক করে দুধ খাচ্ছেন। ওহো! অধিক উচ্ছ্বাস ভালো নয়। দেখো, এই শালটা কি তোমার পছন্দ?'

'খুব সুন্দর।'

'আর তোমার জন্যে এই টুপিটা?'

'অপূর্ব! আর আপনার জন্যে এই সুন্দর চাদরটা?'

'পকেটে হাত ঢুকিও না। তোমার সঙ্গে আমার একটা অদ্ভুত সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, যদিও আমি তোমার নাম জানি না, তুমিও আমার নাম জান না।'

'আপনার নাম সম্ভবত আমি জানি, প্রবোধ।'

'আশ্চর্য! কি করে জানলে?'

'গভীর রাতে আপনার কাছে অনেকে আসেন। মজলিশ বসে যায়। সে এক অন্য জগতের ব্যাপার। আপনাকে প্রবোধবাবা, প্রবোধবাবা বলে ডাকেন।'

'তুমি শুনতে পাও?'

'স্পষ্ট।'

'সে কি? তাহলে তুমি অনেকটা এগিয়ে আছ।'

'বিয়ে করা কি উচিত হবে!'

'আমি করেছি—পার্বতী আমার গুরু, আমার সহধর্মিণী। আমাকে সে গিলে ফেলে উগরে দিয়েছে। যেমন পার্বতী মহাদেবকে করেছিলেন।'

'আমার ভয় করছে। প্রথম কথা আমি আপনাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। দ্বিতীয় কথা, আমার তো কোনো রোজগার নেই।'

'তোমরা আমার কাছেই থাকবে। তোমরা নীচে, আমি ওপরে। আর রোজগার? ওই দোকানের তুমিও একজন অংশীদার কর্মী হবে। কত টাকা চাই? একবস্তা, দু'বস্তা। শঙ্কর! মেয়েটা দেবী। পরে বুঝবে।'

'আপনি আমার নাম জেনে ফেলেছেন?'

'এ আশ্চর্যের কিছু নয়। একদিন তুমিও পারবে।'

'আমাকে তো কিছুই করালেন না!'

'আমি তো তোমাকে দিয়ে যাব। তোমার কিছু করার দরকার নেই। আমার মতো জীবন-মরণ কষ্ট তোমাকে ঝরতে হবে না। তুমি ভালোবাসো। ওর চেয়ে শ্রেষ্ঠ সাধনা আর নেই। আজ পূর্ণিমা। ওই জায়গাটার মাথার ওপর থালার মতো চাঁদ। রুপোলি আলোর বন্যা। সেই আলোয় সবাই চকচক করছে। রঙ-বেরঙের পোশাক। গরম গরম খাবার ধোঁয়া ছাড়ছে। মশলার গন্ধ। চাঁদের পাশ দিয়ে সাদা পক্ষীরাজের মতো ভেসে যাচ্ছে হালকা একখণ্ড মেঘ। তোমাদের নিয়ে আজ আমরা খুব আনন্দ করব। মানুষই হাসে, মানুষই কাঁদে। ভগবানের সুখ-দুঃখ নেই, তাই তাঁর কিচ্ছু নেই। সাক্ষী পুরুষ। তুমিই মরবে, তুমিই বাঁচবে, তুমিই কাঁদবে, তুমিই হাসবে। প্রেমও তোমার, ঘৃণাও তোমার। তোমারই রোগ, তোমারই আরোগ্য। পাহাড় ঘেরা মধ্যপ্রদেশের ভীষণ অরণ্যে পার্বতী আমাকে বারোটা বছর সাধন করিয়েছে। তিন তিনবার আমাকে সাপে কামড়েছে, তিনবারই পার্বতী আমার বিষ তুলে নিয়েছে। কাপালিকরা মহাকালের কাছে আমাকে বলি দিতে চেয়েছে। পার্বতী রক্ষা করেছে। অঘোরীরা আমার দেহ খণ্ড খণ্ড করতে চেয়েছে। পার্বতী চামুণ্ডা মূর্তি ধরে আমাকে রক্ষা করেছে। প্রেত-পিশাচের দুনিয়ায় কুণ্ডলিনীর শক্তি ছাড়া তুমি এগোবে কি করে! সব শেষে এই হিমালয়। তখন আর দেহ নয়, মন। পার্বতী কামরূপ-কামাখ্যার বজ্র-যোগিনী। বৌদ্ধ-তন্ত্রে সিদ্ধা। মারণ, উচাটন-বশীকরণ, কামকলা তার আয়ত্তে। তার বশীকরণ শক্তিতে আমার স্মৃতি যেমন লোপ পেয়েছিল, আবার ফিরে এল শুধু এক জন্মের নয়, জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি নিয়ে। কাল কি হয়েছিল এটা মনে রাখা অতীত জ্ঞান নয়। পূর্বজন্মই অতীত, পরজন্মই ভবিষ্যৎ। পৃথিবীর সমস্ত অন্ধকারকে টেনে বের করে আনাই ডাকিনী বিদ্যা। তোমাকে বলিনি আগে, আজ বলছি, আমি হাততালি দিলে, যে শুনবে সে-ই সম্মোহিত হবে। সব ভুলে যাবে। যে-টুকু মনে করাব, সেইটুকুই মনে পড়বে। দশমহাবিদ্যার সমস্ত রূপ পার্বতী আমাকে দেখিয়েছে। ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ সংসারে আমার স্থান হল না। আমার শেষ গতি ওই গুহায়। তোমাকে কেন যেতে দিইনি জান, ঢুকলে আর বেরোতে পারবে না। তুমি এখনো যুক্তিবাদী, প্রচলিত বিজ্ঞানেই বিশ্বাসী। স্বাভাবিক। এখনো জীবনের অনেকটাই তোমার দেখা বাকি। যে-অরণ্যে আমাদের বারোটা ভয়ংকর বছর কেটেছে, সেখানেই

মহাভারতের কালে মহামুনি বশিষ্ঠদেবের আশ্রম ছিল। শঙ্করাচার্য সাধনা করেছিলেন। এইখানেই অঘোরীরা তারা দেবীর শিলায় তাঁকে বলি দিতে গিয়েছিল। শঙ্করাচার্যের অতি প্রিয়, অনুগত শিষ্য পদ্মপাদ তাঁকে রক্ষা করেন। পদ্মপাদ নৃসিংহের উপাসক ও সিদ্ধ ছিলেন। তিনি নৃসিংহ মূর্তি ধারণ করে অঘোরীদের চক্র তছনছ করে দিয়েছিলেন। বর্তমান মুছে যায়, অতীত মোছে না। বর্তমান অতীতে স্থায়ী হয়, তখন গল্প নয়, কল্প নয়, ইতিহাস। এত বড় ভূমিকার পর সেই অবিশ্বাস্য কথাটা বলি, ওই গুহার মধ্যে বুদ্ধদেবের আসন। অমিতাভ বুদ্ধ। তিনি আসেন, আবার চলে যান, আবার আসেন। কেউ জানেই না, ওখানে একটা গুহা আছে। কেউই আমাদের ছেড়ে চলে যাননি, বুদ্ধদেব, যীশু, মহাপ্রভু, পরমহংসদেব, স্বামীজী, সারদা মা, সিস্টার নিবেদিতা। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। ডাকলেই দেখা দেন।'

আপনি আমার নাম জেনে ফেলেছেন?

।। চার।।

আশ্চর্য রকমের ঝকঝকে আকাশ, আর থালার মতো সেই চাঁদ। অবাক হয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে। আভাস পেয়েছে, আজ বিশেষ একটা কিছু হবে। ক্লান্ত যাত্রীদল চটিতে চটিতে। আজকের মতো চলা শেষ। ধাবায় আজ একটু বেশি লোক। অনেক পাগড়িধারী। সম্ভবত রাজস্থানের যাত্রী। গেরুয়া আলখাল্লা পরা কয়েকজন। একজনের কোলে সারেঙ্গির মতো একটি বাদ্যযন্ত্র। আমি অন্যদিনের তো সহজ হতে পারছি না। কুংকুকে আজ ভীষণ সুন্দরী, অনেক বেশি প্রাণচঞ্চল দেখাচ্ছে। সে কি জানতে পেরেছে, আজ বিশেষ কিছু হবে! একবার মাত্র তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছি। বেশ ভয় করছে। এক দিকে এত প্রাণ, আর আমি একেবারেই নিষ্প্রাণ। কি যে আমার জীবনদর্শন! কি যে আমি চাই! নিজের জীবন নিয়ে খেলা। বোবা প্যাঁচার মতো চুপ করে বসে আছি।

চাঁদ যেন তরতর করে উঁচু পাহাড়টার মাথায় চড়তে যাচ্ছে। দুটি শৃঙ্গ, একটির নাম জয়, আর একটি বিজয়। চাঁদের অনেকটা কাছে আছি, তাই এত আলো। গলা কাচের মতো চারপাশে থইথই করছে। জায়গাটা ক্রমশই নির্জন হয়ে আসছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে বাতাসের হুস্‌হুস্‌ শব্দ। কোন তলানিতে পড়ে আছে উত্তর কলকাতার জীবন! অথর্ব জমিদার, পাগল, আধপাগল সব বংশধর। শ্যাওলা-ধরা বিভিন্ন বয়েসের মেয়েরা। চোখ দিয়ে শরীর লেহন। যৌন বিকৃতি। খালি হয়ে আসা সিন্দুক। যক্ষপুরীর গয়না। সব গঙ্গার গ্রাসে চলে যাক না।

কাঁধে হাত রেখে প্রবোধবাবা বললেন, 'এইবার চলো।'

'কোথায় যাব?'

'পেছনের ঘরে।'

একটা হাত আমার কাঁধে, আর একটা হাত কুংকুর কাঁধে। পেছন দিকে বেশ বড় একটা ঘর। পাথর ধাপে ধাপে নেমে গেছে খরস্রোতা নদীতে। তারপর পাহাড়। ঘরের মাঝখানে পুরু কম্বলের ওপর বসে আছেন, মা জগদ্ধাত্রী না কি? কি রূপ! পেতলের মতো ঝকঝকে। দু' চোখে বিদ্যুৎ। ছুরির মতো গলার স্বর, 'এসো শঙ্কর, তোমার জন্যেই বসে আছি।'

ভয়ে ভয়ে প্রণাম করলুম। মাথার পেছনে একটা হাত রাখলেন। বেশ বুঝতে পারলুম, একটা ঘোর নামছে। পশমের চাদরটা কুংকুকে জড়িয়ে দিলুম। প্রবোধবাবা বললেন, 'শঙ্কর, তোমার সামনে বসে আছেন পার্বতী মা। কুংকু আজই প্রথম জানতে পারবে সে কে? আমাদের মেয়ে।'

মাতাজী আমাদের বাঁদিকে, আমরা দুজনে মুখোমুখি। আমার দুটো হাতের ওপর কুংকুর দুটো হাত। লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে রুদ্রাক্ষের মালা রেখে বেশ কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়ে বসে থাকলেন। তারপর মালা ও কাপড় তুলে নিলেন। ছোট্ট একটা রুপোর কৌটো থেকে ছোট্ট ছোট্ট দুটো গুলি বের করে দুজনের জিভে ফেলে দিলেন। অপূর্ব সুগন্ধ। সারা শরীরে অদ্ভুত এক উত্তাপ। কুংকুর ফর্সা মুখে লাল আভা স্পষ্ট হচ্ছে। ভয়ংকর একটা আবেগ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। কুংকু দু'হাত দিয়ে আমার হাত দুটো চেপে ধরেছে। তার মুঠো ক্রমশ বজ্রমুঠো হয়ে উঠছে। মাতাজী বলছেন, 'তোমার মধ্যে ভালোবাসা আছে, তাই কুংকুও তোমাকে ভালোবাসবে। তোমরা অনেক অনেক দিন সুখে-আনন্দে বেঁচে থাকবে।

একহাজার ফুটের নীচে নেমো না বাতাস সেখানে ভারী। দূষিত। চিন্তার স্তর জট পাকানো। প্রেম নেই শুধু হিংসা। পবিত্র গঙ্গা যেন একটা নর্দমা।'

মাতাজী দুটো কাঠের মালা আমাদের গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'বদলা-বদলি কর।' পরের নির্দেশ 'চন্দন কাঠের মালা। নিজেদের জীবনের মতো যত্ন করবে। হাজার হাজার জপ ধরে রাখবে। একদিন ওই মালা নিজের শক্তিতেই ঘুরতে থাকবে। তোমাদের নিজেদের শক্তিই তোমাদের ঠিক পথে, ঠিক লক্ষ্যে নিয়ে যাবে। অন্য সব শক্তি তুচ্ছ। এইবার ওই পর্দাটা সরিয়ে ভেতরে যাও। আড়ালে একটা সুড়ঙ্গ আছে। ঢুকে যাও। কিছুটা গেলেই চওড়া একটা জায়গা। শিব আছেন। কিছুক্ষণ বসে থাক। এক সময় ওপরের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো ঠিক লিঙ্গের মাথার ওপর পড়বে। তখন পুজো করবে। জল দেবে, কর্পূর দেবে। শ্বেত আকন্দ দেবে। সব সাজানো আছে। প্রদীপ জ্বলছে।'

আশ্চর্য একটা পথ। প্রথমে সরু, তারপর প্রশস্ত, তারপর গর্ভমন্দিরের মতো একটা স্থান। স্বয়ম্ভূলিঙ্গ শিব। কর্পূরের গন্ধ। শ্বেত, শুভ্র। কুংকু আমার পাশে না বসে কোলে বসে পড়ল। মাথাটা হেলিয়ে আমার কাঁধে। চুল ছড়িয়ে পড়েছে আমার পিঠে। অর্ধনারীশ্বর। আমার হাত দুটো জোর করে তুলে দিয়েছে তার বুকে। তার সারা শরীরে একটা তরঙ্গ খেলছে। আমার হাতের ওপর গরম নিঃশ্বাস পড়ছে। সাপের মতো হিস্ হিস্ শব্দ। আর ঠিক তখনই ওপর থেকে চাঁদের আলোর একটা রেখা নেমে এল শিবলিঙ্গের মাথায়। চতুর্দিকে রূপ আর রূপে কি হচ্ছে, আর কি না হচ্ছে! আছি না নেই। একটু পরে থাকব কি-না তাও জানি না। কুংকু তার শরীরটা সম্পূর্ণ আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছে। কস্তুরির গন্ধ! এখন আমি কি করব মহাদেব? পুজো করব না ভালোবাসব! আমার কোলে এই কি আমার সাধনার সিদ্ধির ফল? এ যে ভীষণ ভালোবাসা ভোলানাথ! তুমি তো বিশ্বপ্রেম হরসুন্দর! এ কি আলো! আমার গৌরীর মুখে।

হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে অনায়াসে বেরোতে লাগল শঙ্করাচার্য রচিত সেই সব অনবদ্য শিব-স্তোত্র —এই হিমালয়ের বদরিকাশ্রমে বসে লিখেছিলেন, গৌরীকুণ্ড তাঁরই অপার মহিমার প্রকাশ—

হে পার্বতীহৃদয়বল্লভ চন্দ্রমৌলে,
ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশজপে
হে বামদেব ভব রুদ্র পিনাকপাণে,
সংসারদুঃখগহনাভজগদীশ
রক্ষ।।
গৌরীবিলাসভুবনায় মহেশ্বরায়,
পঞ্চাননায় শরণাগত কল্পকায়।
শর্বায় সর্বজগতামধিপায় তস্মৈ
দারিদ্রাদুঃখদহনায় নমঃ
শিবায়।।

'মা, মা, তুমি কোথায়—আমি শক্তিতত্ত্ব বুঝতে পারছি, পুরুষ-প্রকৃতির অভিন্নতা, তোমার কৃপা।'

'আমি তোমার পেছনেই আছি, তোমার কোলে আনন্দ ভৈরবী, আজ তোমার পূর্ণাভিষেক হল।

আনন্দাসনে সিদ্ধিলাভ। এই নাও আমাদের ত্রিশূল। সযত্নে এই শক্তি রক্ষা কোরো। পুরুষ আর প্রকৃতির মিলন অনুভূতিতেই পূর্ণব্রহ্মের প্রকাশ। এখন বাইরে এসে দেখ, আজ কত সাধু-মহাত্মার সমাবেশ হয়েছে। আজ মহা উৎসবের দিন। তোমাদের কল্যাণ হোক।'

ছবি : গৌতম দাশগুপ্ত